ডাকসু নির্বাচনের ফল ও ক্যাম্পাসের ভবিষ্যৎ

চিররঞ্জন সরকার
১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:০০ এএম

ডাকসু নির্বাচন সব সময়ই বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসেবে দেখা হয়। দীর্ঘ ছয় বছর পর অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে যে আগ্রহ তৈরি হয়েছিল, তা নির্বাচনের দিনে অভূতপূর্ব অংশগ্রহণে রূপ নিয়েছে। ভিপি, জিএস, এজিএসসহ কেন্দ্রীয় কমিটির মোট ৯টি পদে ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের’ প্রার্থীদের জয় শুধু ক্যাম্পাস নয়, জাতীয় রাজনীতিতেও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এসেছে। আবু সাদিক কায়েম ভিপি পদে প্রায় ১৪ হাজার ভোট পেয়ে নির্বাচিত হওয়া, এসএম ফরহাদ ও মহিউদ্দিন খানের যথাক্রমে জিএস ও এজিএস পদে বিজয় এই নির্বাচনের মূল ধারা নির্দেশ করে। এটি একদিকে শিবিরের সাংগঠনিক দৃঢ়তার প্রতিফলন, অন্যদিকে প্রচলিত ছাত্র সংগঠনগুলোর ব্যর্থতা ও সীমাবদ্ধতার বহিঃপ্রকাশ।

ভোটের পরিবেশ ছিল উল্লেখযোগ্যভাবে শান্তিপূর্ণ। কোনো বড় অঘটন ঘটেনি, শিক্ষার্থীরা শৃঙ্খলভাবে ভোট দিয়েছেÑ এই অভিজ্ঞতা ঢাবি ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের গণতান্ত্রিকচর্চার জন্য ইতিবাচক দিক। তবে এই শান্তিপূর্ণ আয়োজনের ভেতরে রাজনীতির গভীর পরিবর্তনের সংকেতও লুকিয়ে আছে। কারণ এই নির্বাচনে শিবিরের নিরঙ্কুশ বিজয় কেবল একটি সাংগঠনিক সাফল্য নয়; এটি তাদের দীর্ঘদিনের ভিন্নধারার রাজনীতির সুফল।

শিবির এক যুগ ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন ক্যাম্পাসে ধীরে ধীরে ভিন্ন কৌশল গ্রহণ করেছে। প্রচলিত মিছিল-মিটিংনির্ভর রাজনীতি এড়িয়ে তারা সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, শিক্ষাবান্ধব উদ্যোগ এবং একটি ধারাবাহিক আদর্শভিত্তিক প্রচার চালিয়েছে। অন্যদিকে ছাত্রদল বা অন্যান্য দল যখন শোডাউন, ক্ষমতার দাপট এবং প্রচলিত ‘রাজপথ দখল’ রাজনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছে, তখন শিবির শিক্ষার্থীদের মনস্তাত্ত্বিক জায়গায় পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে। শিক্ষার্থীরা প্রচলিত ক্ষমতাকেন্দ্রিক ছাত্র রাজনীতি থেকে দূরে সরে গিয়ে ভিন্ন ধরনের আস্থার খোঁজ করেছে, আর সেই জায়গাটা পূরণ করেছে শিবির। ছাত্রদলের ব্যর্থতা এখানে সবচেয়ে স্পষ্ট। তাদের রাজনীতির মূল শক্তি সব সময় ছিল বিএনপির ক্ষমতার সঙ্গে সম্পর্ক। কিন্তু বিএনপি যখন জাতীয় পর্যায়ে আস্থাহীনতায় ভুগছে, তখন ছাত্রদলও সেই

ধাক্কা খেয়েছে। তাদের সাংগঠনিক দুর্বলতা, পাল্টাপাল্টি সমালোচনা, আদর্শগত দৃঢ়তার অভাব এবং শিক্ষার্থীদের জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত কার্যক্রমের ঘাটতি এই নির্বাচনে তাদের প্রান্তিক অবস্থানে নিয়ে গেছে। শিবির যেখানে আদর্শ থেকে শক্তি পেয়েছে, ছাত্রদল সেখানে ক্ষমতার অনিশ্চয়তায় ভেঙে পড়েছে।

বামপন্থি শক্তির অবস্থানও সমানভাবে হতাশাজনক। বিভক্তি, ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব এবং নেতৃত্বের সংকীর্ণতা তাদের প্রগতিশীল অবস্থানকে দুর্বল করেছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বা প্রগতিশীলতার বয়ান শিক্ষার্থীদের একাংশের কাছে এখনও গ্রহণযোগ্য হলেও সাংগঠনিক ব্যর্থতা ও অদূরদর্শী সিদ্ধান্ত তাদের শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী হতে দেয়নি। মেঘমল্লার বসুর মতো সম্ভাবনাময় প্রার্থী থাকলেও অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব তাকে এগোতে দেয়নি। এই দুর্বলতা শিবিরকে সুযোগ করে দিয়েছে নিজেদের অবস্থান মজবুত করার।

এখানে জামায়াত-শিবিরের কৌশলগত সাফল্যের কথাও উল্লেখ করতে হয়। তারা হলে হলে নিয়মিত প্রচারণা চালিয়েছে, শিক্ষার্থীদের খাবার-দাবার ও নানা আয়োজনের মাধ্যমে কাছে টেনেছে। ছাত্রী হলে নারী নেতৃত্বকে সম্পৃক্ত করা এবং সাংগঠনিক শক্তি বিস্তৃতভাবে ব্যবহার করা তাদের বিজয়ের অন্যতম কারণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে ও বাইরে প্রচারণা ছড়িয়েছে যে, শীর্ষ পদগুলো এখন জামায়াতপন্থিদের নিয়ন্ত্রণে। এই ধরনের ধারণাও তাদের বিজয়ে ভূমিকা রেখেছে।

এই নির্বাচনের ফলাফল কেবল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই সীমাবদ্ধ থাকবে না। জাতীয় রাজনীতিতে এর প্রভাব পড়বে। প্রগতিশীল শক্তি চাপে পড়বে, আর ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নতুন উদ্যম পাবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই নির্বাচনের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক শিক্ষা পরিবেশ কেমন হবে। ডাকসুকে ‘মিনি পার্লামেন্ট’ বলা হয় শিক্ষার্থীদের কল্যাণ ও সমস্যা সমাধানের জন্য। তাই বিজয়ী-পরাজিত নির্বিশেষে সবার দায়িত্ব হবে শিক্ষার্থীদের জন্য একটি সুন্দর, নিরাপদ ও শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ তৈরি করা। দীর্ঘদিনের সংঘাত, দমননীতি এবং ক্ষমতাকেন্দ্রিক দ্বন্দ্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ইতোমধ্যেই ক্ষতিগ্রস্ত। তারা শান্তিপূর্ণ পড়াশোনার পরিবেশ চায়। নির্বাচনের এই ইতিবাচক অভিজ্ঞতা যদি ধরে রাখা যায়, তবে শিক্ষার্থীরা অন্তত পড়াশোনায় মনোনিবেশ করার সুযোগ পাবে।

বিজয়ীরা যদি একে রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার না করে, বরং প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার্থীদের জন্য কাজ করে, তবে এটি সবার জন্য সুফল বয়ে আনবে। একই সঙ্গে পরাজিত সংগঠনগুলোরও আত্মসমালোচনা করে শিক্ষার্থীদের মন জয় করার নতুন পথ খুঁজে বের করা প্রয়োজন। সমালোচনার রাজনীতি বা অন্ধ বিরোধিতার পরিবর্তে ইতিবাচক ও ভিন্নধারার কার্যক্রম চালানো ছাড়া সামনে তাদের আর কোনো বিকল্প নেই।

অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে বলা যায়, ছাত্র রাজনীতি যদি আদর্শভিত্তিক ও শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক না হয়, তবে তা দীর্ঘমেয়াদে টেকসই হয় না। ক্ষমতার লোভে বা অস্থায়ী সুবিধার আশায় ছাত্র সংগঠনগুলো বারবার নিজেদের ক্ষতি করেছে। আজকের প্রেক্ষাপটে শিবিরের বিজয় সেই বার্তার পুনরাবৃত্তি করছে যে, আইডিওলজি ছাড়া রাজনীতি টিকে না। ছাত্রদল বা বাম শক্তি যদি ভবিষ্যতে নিজেদের পুনর্গঠন করতে চায়, তবে তাদের প্রথম দায়িত্ব হবে শিক্ষার্থীদের আস্থা পুনরুদ্ধার করা।

সবচেয়ে বড় প্রত্যাশা এখন একটাইÑ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবার যেন তার স্বকীয়তা ফিরে পায়, যেখানে শিক্ষার্থীরা নির্ভয়ে, নিরুপদ্রবে, পূর্ণ মনোযোগে তাদের লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করতে পারে। ডাকসুর মূল দর্শনই ছিল শিক্ষার্থীদের অধিকার রক্ষা, তাদের স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া এবং শিক্ষাঙ্গনে গণতান্ত্রিকচর্চা প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু ইতিহাস বারবার দেখিয়েছে, ডাকসুর মঞ্চ অনেক সময় শিক্ষার্থীদের কল্যাণের জায়গা থেকে সরে গিয়ে দলীয় আধিপত্য বিস্তারের হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবারের নির্বাচন একটি নতুন অধ্যায় খুলেছে, আর সেই অধ্যায়কে কোন দিকে নেওয়া হবে, তা নির্ভর করছে বিজয়ী ও পরাজিত উভয় পক্ষের দায়িত্বশীলতার ওপর। বিজয়ীরা যদি শুধুই ক্ষমতার মোহে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে ব্যস্ত হয়, তবে তাদের এই জয় হবে ক্ষণস্থায়ী এবং ধ্বংসাত্মক। অন্যদিকে পরাজিতরা যদি কেবল সমালোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তবে তারাও শিক্ষার্থীদের আস্থা পুনরুদ্ধার করতে পারবে না। এ মুহূর্তে সবচেয়ে জরুরি হলো দলীয় রাজনীতির সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে সম্মিলিতভাবে একটি সুন্দর, শান্তিপূর্ণ এবং শিক্ষাবান্ধব ক্যাম্পাস গড়ে তোলা। শিক্ষার্থীরা ডাকসু থেকে শোডাউন বা দখল নয়, বরং তাদের প্রতিদিনের সমস্যার সমাধান, লাইব্রেরি ও গবেষণাগারের উন্নয়ন, আবাসন সংকট নিরসন এবং মুক্তচিন্তার অনুকূল পরিবেশ প্রত্যাশা করে।

এই নির্বাচন প্রমাণ করেছে যে, শিক্ষার্থীরা পরিবর্তন চায়। তারা প্রথাগত রাজনীতির ঘূর্ণি থেকে বেরিয়ে এসে নতুন আস্থার সন্ধান করছে। আজকের তরুণ প্রজন্ম প্রচলিত ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতিকে প্রত্যাখ্যান করে এমন একটি নেতৃত্ব খুঁজছে, যারা তাদের জীবনের অংশীদার হতে পারবে। তাই বিজয়ী এবং পরাজিত উভয় পক্ষের ওপরই দায়িত্ব বর্তায় শিক্ষার্থীদের এই পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার। ছাত্র রাজনীতি যদি সত্যিই শিক্ষার্থীদের জীবনের সঙ্গে একীভূত হয়, তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবারও হয়ে উঠতে পারে দেশের জ্ঞান, চিন্তা, সংস্কৃতি ও প্রগতির প্রাণকেন্দ্র।

এখন সময় এসেছে সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে সমষ্টিগত দায়িত্ববোধ নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার। ইতিহাস বলছে, যারা ক্যাম্পাসকে বিভাজনের রাজনীতির মাঠে পরিণত করেছে, তারা শেষ পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের হৃদয়ে স্থান ধরে রাখতে পারেনি। ভবিষ্যতেও এর ব্যতিক্রম হবে না। তাই যদি ডাকসুর এই নতুন নেতৃত্ব শিক্ষার্থীদের সত্যিকার অংশীদার হয়, তবে শুধু বিশ্ববিদ্যালয় নয়, গোটা জাতিও লাভবান হবে। অন্যথায় এই জয় পরিণত হবে এক মরীচিকায়Ñ যার চকচকে মোড়কের ভেতর শিক্ষার্থীরা আবারও হতাশা ছাড়া কিছুই খুঁজে পাবে না।

চিররঞ্জন সরকার : কলাম লেখক